৮ম অধ্যায়

# ● সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
## [Social Control]

প্রত্যেক সমাজের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য সমাজের সদস্যদের কতকগুলি বিশেষ জাতীয় আচরণ সম্পাদন করতে হয়, আবার কতকগুলি আচরণধারা থেকে বিরত থাকতে হয়। সমাজের কতকগুলি নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ আছে। সমাজের সদস্যদের তা মেনে চলতে হয় এবং সমাজকেও কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখতে হয় সদস্যরা তা মেনে চলছে কি না। সাধারণভাবে এটিকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। আসলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল একপ্রকার সামাজিক বা কৃষ্টিমূলক পদ্ধতি বা উপায় যেটি ব্যক্তির আচরণধারার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং যার দ্বারা সমাজের সদস্যদের বিশেষ গোষ্ঠী বা সমাজের কর্মপ্রণালী যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় সেই উদ্দেশ্যে সামাজিক ঐতিহ্য, পরম্পরা বা আচরণধারা ঠিকভাবে অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় বা অনুপ্রাণিত করা হয়। John Scott-এর Dictionary of Sociology-তে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছে — "Any social or cultural means by which systematic and relatively consistent restraints are imposed upon individual behaviour and by which people are motivated to adhere to traditions and patterns of behaviour that are important for the proper functioning of a group or society"। তাহলে দেখা যায় Scott সামাজিক নিয়ন্ত্রণে কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কথাও বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে সমাজ যেমন কিছু আচরণ সম্পাদন করতে উৎসাহিত করে, তেমনই কতকগুলি আচরণের উপর নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করে থাকে বিশেষত যে আচরণগুলি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। আবার E. A. Ross বলেছেন — "Social control is the system of devices whereby society brings its members into conformity with the accepted standard of behaviour"। আবার Karl Mannheim বলেছেন — সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল সেইসব পদ্ধতির সমষ্টি যার দ্বারা সমাজ একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মানুষের আচরণধারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। প্রায় প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানীই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদর্শমান ও আদর্শ আচরণধারা বজায় রাখার জন্য ব্যক্তিগত আচরণধারা নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিকেই বুঝিয়েছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, সামাজিক

নিয়ন্ত্রণ বলতে সেই সমস্ত উপায় বা পদ্ধতিকেই বোঝায় যার দ্বারা সমাজ ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সামাজিক আদর্শের মান বজায় রাখে।

প্রত্যেক সমাজে ব্যক্তির চাহিদা ও সামাজিক চাহিদার মধ্যে কিছু বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকে এবং মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির কথা বেশি করে চিন্তা করে। কিন্তু তার ফলে সমাজের ক্ষতি হতে পারে। সমাজ চায় তার বিধি-নিষেধ বা অনুশাসন সমস্ত সদস্য মেনে চলুক। তাই সমাজের শৃঙ্খলা ও সমন্বয় বজায় রাখার জন্য ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতেই হয়। যে সমস্ত উপায়ে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকেই বলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। সমাজ যদি সুশৃঙ্খলভাবে না চলে, তাহলে সমাজ স্থায়ী হতে পারে না। প্রত্যেক সমাজ তার সদস্যদের আচরণধারা বাঞ্ছনীয় পথে পরিচালিত করার জন্য কতকগুলি নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে। এইগুলি ঠিকমত মেনে চললেই সমাজের মঙ্গল। আবার সমাজের সদস্যদের আচরণধারা যদি একমুখী না হয়, যদি তাদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় না থাকে, তাহলে সমাজের মঙ্গল হয় না। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, সামাজিক মূল্যবোধ, সমাজের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি বোধ সৃষ্টি করা হয়। সমাজকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই ব্যক্তিবর্গের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। যারা সমাজের নিয়মকানুন বা বিধিনিষেধ মানতে চায় না — সমাজ অনেক সময় তাদের পুরস্কারের লোভ বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে সামাজিক নিয়মকানুন মানতে বাধ্য করে। এই পদ্ধতিও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অধীনেই পড়ে। আবার কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন সামাজিকীকরণ পদ্ধতিতে কোন ত্রুটি থাকলেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির সামাজিকীকরণ ঠিকমত হয়ে থাকলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আপনা-আপনি হয়ে যায়। সেইজন্য La Pierre বলেছেন — "Social control is a correction for inadequate socialization"। যাইহোক আমরা বলতে পারি, সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য সমাজ তার সদস্যদের আচরণধারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং যে সমস্ত উপায়ে তা করা হয় তাকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। এর ফলে সমাজে শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় থাকে। ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব করা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নয়, বরং ব্যক্তির আচরণধারার সঙ্গে সমাজের চাহিদার সংহতি সাধন করে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়।

**■ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ (Types of Social Control) :**

সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে প্রধানত দু-ভাগে ভাগ করা হয়, যথা — বিধিবদ্ধ (Formal) এবং অবিধিবদ্ধ (Informal)। যখন সামাজিক আদর্শ, রীতি বা মূল্যবোধ কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতিতে সমাজের সমস্ত সদস্যদের বোঝানো হয় এবং সেইভাবে বাঞ্ছিত আচরণ সম্পাদন করতে সাহায্য করা হয়, তখন সেগুলিকে বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ বলা

হয়। কিন্তু যখন অপরিকল্পিতভাবে বা অন্য কোন সূত্রে সমাজকে তথা সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তখন সেটিকে অবিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। এই সব পদ্ধতি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু এগুলি পরোক্ষভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। সেইজন্য বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে প্রত্যক্ষ ও অবিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণকে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বলে। অনেক ক্ষেত্রে আইনের সাহায্যে কিংবা বল প্রয়োগ করেও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু শিক্ষার সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়ে সহানুভূতি ও ধৈর্যের সহায়তায় যে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি, সেটি অধিকতর কার্যকরী হয়। বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন করে যে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়, তার ফল স্থায়ী হয় না। অনেক সমাজবিজ্ঞানী আবার নিয়ন্ত্রণকে স্বতঃস্ফূর্ত (Spontaneous) এবং আরোপিত (Enforced) — এই দুভাগে ভাগ করেছেন। যখন জনসাধারণ নিয়ন্ত্রণে নিজের থেকে সাড়া দেন, তখন তা স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু যখন কোন ভয়, যেমন — আইনের ভয়, শাস্তির ভয়, সামাজিকভাবে বয়কট প্রভৃতি কারণে ইচ্ছা না থাকলেও নিয়ন্ত্রণে রাজী হয়ে যান, তখন তা আরোপিত নিয়ন্ত্রণ।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ সম্পর্কে যে সমস্ত মতামত জ্ঞাপন করেছেন, সেগুলি থেকে আমরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকারগুলি সম্পর্কে এই সমস্ত তথ্য জানতে পেরেছি —

● **(১) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Direct and Indirect Social Control) ঃ** যখন মাতা-পিতা, অভিভাবক, শিক্ষক অথবা পরিবারের বন্ধু স্থানীয় কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ সামাজিক আচরণকে অপছন্দ করে বা অবাঞ্ছিত মনে করে বুঝিয়ে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন, তখন তাকে প্রত্যক্ষ (Direct) নিয়ন্ত্রণ বলে। আবার কোন আদর্শ আচরণ লক্ষ্য করে, মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করে, সামাজিক ঐতিহ্য ও রীতি-নীতি অনুযায়ী অন্যদের আচরণ করতে দেখে ব্যক্তি নিজের আচরণ ধারার পরিবর্তন করে, তখন তাকে পরোক্ষ (Indirect) নিয়ন্ত্রণ বলে।

● **(২) ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Positive and Negative Social Control) ঃ** সমাজে বিশেষ কতকগুলি ব্যবস্থা বা রীতি ব্যক্তির আচরণ সদর্থক দিকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন, ব্যক্তিকে কোন কাজের জন্য বা কোন বিশেষ আচরণের জন্য প্রশংসা করলে, সুখ্যাতি করলে বা তাকে শ্রদ্ধা জানালে সে ঐ রকম আচরণ আরও বেশি করে করতে চাইবে। শিশুদের ক্ষেত্রে এই প্রশংসা বা উৎসাহদান খুবই কার্যকরী। এরকম উপায়ে যে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে বলে ধনাত্মক (Positive) নিয়ন্ত্রণ। আবার যখন সমালোচনা বা শাস্তির ভয়ে ব্যক্তি কোন আচরণধারা নিয়ন্ত্রিত করে, তখন তাকে বলে ঋণাত্মক (Negative) নিয়ন্ত্রণ।

● **(৩) সচেতন ও অচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Conscious and Unconscious Social Control) ঃ** ব্যক্তি যখন সচেতনভাবে অর্থাৎ জ্ঞাতসারে আইন বা সমাজের রীতি-নীতি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে, তখন

তাকে সচেতন বা জ্ঞাতসারে (Conscious) নিয়ন্ত্রণ বলে। কিন্তু যখন সামাজিক ঐতিহ্য বা কৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ব্যক্তি আপনা-আপনি নিজের অজান্তে কোন আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে, তখন তাকে অচেতন বা অজ্ঞাতসারে (Unconscious) নিয়ন্ত্রণ বলে।

● **(৪) বিধিবদ্ধ বা নিয়মতান্ত্রিক ও অবিধিবদ্ধ বা নিয়ম বর্হিভূত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Formal and Informal Social Control) ঃ** কোন দেশের সরকার আইন প্রণয়ন করে বা সরকারী নির্দেশ জারী করে যখন ব্যক্তিকে আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে বাধ্য করে, তখন তাকে বিধিবদ্ধ বা নিয়মতান্ত্রিক (Formal) নিয়ন্ত্রণ বলে। কিন্তু জনগণের চাপে যখন ব্যক্তি তার আচরণধারা নিয়ন্ত্রিত করেন, তখন তা অবিধিবদ্ধ (Informal) নিয়ন্ত্রণ। প্রত্যেক ব্যক্তি কি রকম সামাজিক আচরণ করবেন, তার একটা নির্দেশ আইন শাস্ত্রে দেওয়া আছে। সকলকে তা মেনে চলতেই হবে। কিন্তু একজন মন্ত্রী বা জন-প্রতিনিধির আচরণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সরকারী নীতি ঘোষণা না করা হলেও তাঁরা কিন্তু জনগণের সামনে নিজেদের ভালো বা মহান রূপে তুলে ধরতে বা জনসমর্থন হারানোর ভয়ে আচরণধারা নিয়ন্ত্রিত করেন। এটি হল অবিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টান্ত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এরকম নিয়ন্ত্রণের বহু উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়।

■ **সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংস্থা (Agencies of Social Control) ঃ**

সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংস্থা বলতে সেই সমস্ত পদ্ধতি বা ব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন যার মাধ্যমে সামাজিক আদর্শ, রীতি বা মূল্যবোধ সমাজের সদস্যদের মধ্যে সঞ্চালিত করা হয় এবং সেগুলিকে ফলপ্রসূ করা হয়। এগুলি কতকগুলি সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তব সত্তা যেগুলি ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠিত এবং ঐসব ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এইসব সত্তা বা অস্তিত্ব সমাজের একটি মানগত রূপ নির্মাণ করে দেয় এবং সমাজের সদস্যদের তা অনুসরণ করতে হয়। এগুলি হল সমাজের 'কার্যকরী সংস্থা' যেগুলি ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে তার মধ্যে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে এবং সামাজিক মান বজায় রাখে। এই সমস্ত সামাজিক মান বা আদর্শ সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। এই জাতীয় সংস্থাকে তাদের স্বরূপ ও কার্য পদ্ধতি অনুসারে **বিধিবদ্ধ** (Formal) এবং **অবিধিবদ্ধ** (Informal) এই দুভাগে ভাগ করা যায়। অনেকে আবার এই সংস্থাগুলিকে **সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপাদান** বলেও অভিহিত করেন।

❑ **বিধিবদ্ধ মাধ্যম (Formal Agency) ঃ**

বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংস্থা হিসাবে উল্লেখযোগ্য হল —

(১) আইন (Law)

(২) শিক্ষা (Education)

(৩) বল প্রয়োগ (Coercion)

● (১) আইন (Law) ঃ

বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল সেই জাতীয় নিয়ন্ত্রণ যা কোন সুনির্দিষ্ট জনসমষ্টি বা সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া থাকে জনগণকে বিশেষ আচরণ সম্পাদন করতে, বিশেষ আদর্শ বা মান বজায় রাখতে এবং বিশেষ জাতীয় আচরণধারা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করার জন্য। আইন হল আধুনিক সভ্য সমাজে এরকম একটি শক্তিশালী নিয়ামক বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা। প্রত্যেক দেশের সরকার কতকগুলি নির্দিষ্ট আইন বলবৎ করেন এবং জনগণ তা মানতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকেন (Legal imperatives)। যদি কেউ এই আইন অমান্য করেন, ভঙ্গ করেন বা তার বিরোধিতা করেন, তবে তাকে আইনগতভাবে শাস্তি পেতে হয়। পুলিশ, আদালত, জেলখানা এবং কখনও কখনও সেনাবিভাগ (যেমন — উপদ্রুত বা সন্ত্রাস কবলিত অঞ্চলে) এই আইন রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকে এবং আইনভঙ্গকারীদের বিধিবদ্ধ সম্মতি প্রাপ্ত হয়ে নানা ধরনের শাস্তি, যেমন — প্রহার, গুলি চালনা, জেলে প্রেরণ ইত্যাদি প্রদান করে আইন মানতে বাধ্য করে। পুলিশই হল সমাজের নিকটবর্তী সংস্থা যারা আইনভঙ্গকারীদের বিচারের এবং পরবর্তী শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। আইনের বিভিন্ন ধারা আছে এবং কোন্ আইন ভঙ্গ করলে কিরকম শাস্তি পেতে হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে Indian Penal Code-এ। আইনের কতকগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন —

(১) আইন তখনই আইন বলে গণ্য হয় যখন তা আইনসম্মত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত, বলবৎ ও আরোপিত হয়।

(২) আইন সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট এবং লিখিত।

(৩) আইন সকলের জন্য সমান — ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ সকলে আইনের দৃষ্টিতে সমান।

(৪) আইন মেনে চলা প্রত্যেকের কর্তব্য, কিন্তু আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতেই হবে।

(৫) রাষ্ট্র আইনের সাহায্য নেয় ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

(৬) দেশের বা সমাজের প্রয়োজনে আইনের পরিবর্তন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন করা হতে পারে।

রাষ্ট্র চায় একদিকে সমাজের কল্যাণসাধন, অন্যদিকে ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান। ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষিত হলেই সমাজের নিরাপত্তাও রক্ষিত হবে। এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ভারতীয় সংবিধানে প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। আইন প্রতিটি মানুষের জন্য একটি সুস্থ, অনুকূল সামাজিক পরিবেশ রচনা করতে সাহায্য করে। তাই কোন কারণে সামাজিক পরিবেশের কোন

প্রকার পরিবর্তন ঘটলে আইনের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আইন লঙ্ঘন করলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকায় সকলে আইনকে ভয় পায় এবং আইনানুযায়ী আচরণ করতে চায়। তাছাড়া আইনের হাতে শাস্তি পেলে সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পায়। তাই সকলে আইন মেনে নিজেদের আচরণধারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। যাঁরা আইনের রক্ষক, তাঁরাও যাতে আইন মেনে চলেন — তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া আইনের প্রয়োগ বিশেষ সুচিন্তিত এবং নিরপেক্ষভাবে করতে হবে। রামের অপরাধের জন্য যেন শ্যাম শাস্তি না পায় এবং লঘু পাপে গুরুদণ্ড বা গুরু পাপে লঘুদণ্ড যেন প্রদান না করা হয়। সেইজন্য আমরা এ কথা বলতে পারি যে আইন সামাজিক নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

● **(২) শিক্ষা (Education) ঃ**

শিক্ষা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি উত্তম মাধ্যম কারণ শিক্ষাই ভাবী নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক ঐতিহ্য, জীবনযাপন প্রণালী ও সামাজিক আদর্শ সঞ্চালিত করে তাদের আচরণধারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে পারে। তাছাড়া শিক্ষার সাহায্যে একসঙ্গে অনেকের আচরণধারার পরিবর্তন করা সম্ভব। সামাজিক আচরণের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকে Bottomore বলেছেন — "Early Socialization of the Child"; অর্থাৎ, শিশুর প্রাথমিক সামাজিকীকরণ। প্রত্যেক সমাজ ভাবী নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক ঐতিহ্য ও ভাবধারা সঞ্চালিত করার জন্য এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। শিক্ষার মাধ্যমেই শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। শিক্ষার মাধ্যমেই সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক আদর্শ, সামাজিক জ্ঞান ও আচরণ পদ্ধতি শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয় যেন শিক্ষান্তে শিশুরা বড় হয়ে সমাজে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে পারে। জন্ম মুহূর্তে শিশুর সমাজ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট জ্ঞান বা ধারণা থাকে না। শিক্ষার মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে শিশুকে নানা প্রকার সামাজিক জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করানো হয়। পরিবেশের, বিশেষত সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিসাধন করতে না পারলে ব্যক্তি সমাজে টিঁকতে পারবে না। শিক্ষা তাকে সঙ্গতিসাধনের কৌশল সম্বন্ধে অবহিত করে এবং তাকে সার্থক অভিযোজনে সহায়তা করে। শিশুদের সামাজিকীকরণ করা প্রয়োজন কারণ তাহলে সে সচেতনভাবেই হোক আর অচেতনভাবেই হোক সমাজের রীতিনীতি অনুসরণ করতে শিখবে। শিশুদের শিখতে হবে কিভাবে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, কিভাবে বিপদ বা অসুখের হাত থেকে নিজেদের বাঁচানো সম্ভব এবং কিভাবে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের সঙ্গে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপন করা যায়। শিক্ষার মাধ্যমে এগুলি যেভাবে শেখা যায় অন্য কোন সংস্থা বা মাধ্যম তেমনটি পারে না। কেবলমাত্র ভাগ্য বা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে থাকলে কেউ এ

সমস্ত কৌশল বা গুণাবলী অর্জন করতে পারে না। প্রত্যেক সমাজ চিন্তা করে কি করে তার সদস্যদের এই সমস্ত কৌশল বা গুণাবলী আয়ত্ত করানো যায় কারণ সেক্ষেত্রে সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে এবং সমাজের অগ্রগতিও সম্ভব হবে। এইজন্য সমাজ শিক্ষার্থীদের সামাজিক মান বা আদর্শ এবং সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে। শিক্ষকরাও সমাজ থেকে শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত হন। তাঁরা নিজেরা সামাজিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত এবং সামাজিক মান বা আদর্শে বিশ্বাসী। তাই সমাজ নিশ্চিন্তভাবে শিক্ষকদের উপর শিক্ষাদানের দায়িত্ব অপর্ণ করে থাকে। শিক্ষা অত্যন্ত সচেতনভাবে এবং সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজটি পরিচালনা করে এবং শিক্ষার্থীদের সামাজিক আদর্শ, রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও কৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞাত করে যাতে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয় এবং সমাজও সমৃদ্ধ হয়। এইভাবে সামাজিক ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

সুতরাং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বলতে হয়, শিক্ষা হল এমন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে শিক্ষার্থী সেইসব কৌশল, দক্ষতা এবং গুণাবলী আয়ত্ত করে যাতে সে উপযুক্তভাবে সামাজিক জীবনযাপন করতে পারে। শিক্ষালয় প্রাথমিকভাবে শিক্ষার্থীকে এমনভাবে সাধারণধর্মী শিক্ষা দেয় যাতে বড় হয়ে তারা সমাজে একটি উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি শিক্ষার সাধারণধর্মী সামাজিক কাজ হলেও শিক্ষার বিশেষধর্মী বহু সামাজিক কাজ থাকে। কিন্তু শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হল শিশুর সামাজিকীকরণ যার সাহায্যে তার মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক বিশ্বাস, সামাজিক আদর্শ, সামাজিক দক্ষতা ইত্যাদি গুণ সন্নিবিষ্ট করা যায়। এক কথায় শিশু বা শিক্ষার্থীকে একজন পূর্ণাঙ্গ সামাজিক সদস্য হিসাবে তৈরী করাই শিক্ষার কাজ।

এটিই হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার ভূমিকা। শিক্ষালয়কে সমাজের একটি ক্ষুদ্র ও আদর্শ প্রতিলিপি বলে মনে করা হয়। সমাজের সকল সদস্যের সঙ্গে শিশুকে কিরকম আচরণ করতে হবে তার প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় থেকে দেওয়া শুরু হয়ে যায়। যদি শিশুর মধ্যে এমন কোন আচরণ লক্ষ্য করা যায় যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, তবে শিশুর সেই আচরণ শিক্ষালয় সংশোধিত করে দেয়। সুতরাং বলা যায়, শিক্ষালয়েই সামাজিক আচরণের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাছাড়া সমাজে সার্থকভাবে টিঁকে থাকতে গেলে সহযোগিতা, দলপ্রীতি, যৌথ মনোভাব, শৃঙ্খলা, যুক্তিপূর্ণ চিন্তন ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং এগুলির চর্চা করা আরও বেশি প্রয়োজন। শিক্ষালয়ের উপরই এই দায়িত্ব অর্পিত হয়। সুতরাং শিক্ষা এই সমস্ত আচরণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষাই শিশুকে সমাজে তার অবস্থান, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করে দেয় এবং শিশুকে এমনভাবে তৈরী করে দেয় যাতে তার সামাজিক অভিযোজনে কোন অসুবিধা না হয়।